অধ্যাপক তাহেরের ‘খুন-হওয়া’ এবং আমাদের ‘হত্যাকাণ্ড-সংস্কৃতি’

রাহমান নাসির উদ্দিন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভু-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. এস. তাহের আহমেদ নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। দেশের সংবেদনশীল মানুষগুলো এ খুনের প্রতিবাদে, ক্ষোভ এবং যুগ-যন্ত্রনার অস্থিরতা থেকে তো বটেই, যে যার অবস্থান থেকে প্রতিবাদমুখর হয়েছেন। এ ঘটনার নিন্দা প্রকাশের মাধ্যমে ঘটনার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে ধিক্কার দিয়েছেন, এবং দিচ্ছেন। ফলোআপ সংবাদসহ সংবাদপত্রে সম্স্লাদকীয় ও উপ-সম্স্লাদকীয় লেখা হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে কিছু গরম-গরম কর্মসুচি দেয়া হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে আরো দেয়া হবে। ছাত্র সংগঠন গুলো, অবশ্যই রহস্যময় কারণে সরকারী দলের ছাত্র-সংগঠন ব্যতিত, ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ করছে, এবং করবে আরো কিছুদিন। এ হচ্ছে এক চিরচেনা দৃশ্যপট। ঘটনার অনুবর্তী অনিবার্য দৃশ্যকল্প। ২০০৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েরই অর্থনীতি বিভাগের আরেক প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস-কে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। সেই প্রেক্ষাপটেও, আমরা একই দৃশ্যপট দেখেছিলাম। সময়ের আবর্তে সে হত্যাকাণ্ডও মুছে গেছে আন্দোলন, মিটিং-মিছিল, প্রতিবাদ-মুখরতা এবং সংবাদপত্রের পাতা থেকে। কেবল, মৃত্যুর যন্ত্রণা এবং স্বজন হারানোর বেদনা বয়ে বেড়ায় নিহতের পরিবার এবং পারিবারিক বলয়। এ ক্ষেত্রেও তা'ই ঘটবে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা-মণ্ডল তারই স্বাক্ষ্য বহন করে। এবং আজকের চরম-গরম কর্মসুচি, তীব্র প্রতিবাদ, সংবাদপত্রের আহাজারি সবকিছু মিলিয়ে যাবে ক্রমান্বয়ে সময়ান্তরে। এটাই এদেশের সকল হত্যাকাণ্ডের সরল ও সাধারণ অনুবর্তী ঘটনাপঞ্জি। কিন্তু এভাবে আর কতো?- সে জিজ্ঞাসার উত্তর-খোঁজবার প্রয়োজন আজ সর্বাগ্রে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্স্লাসে একজন প্রবীণ অধ্যাপকের এই নির্মম হত্যাকাণ্ড আমাদের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় নাঙ্গাপনাকে আরো একবার উন্মোচন করলো। নিরাপত্তার সামগ্রিক প্রকৌশল অধ্যাপক তাহেরের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে পুনর্বার ফাঁকা বুলিতে রূপান্তরিত হলো। পুলিশ, বিডিআর, র‍্যাব, চিতা ইত্যাকার সকল জারিজুরিকে বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে এ নির্মম হত্যাকাণ্ড আরো একবার জাতির সামনে হাজির করলো আমাদের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার এবং নাগরিক নিরাপত্তার ন্যাংটাপনা। সরকারকে, বা পুলিশের দায়িত্বশীলকে, বলতে শুনা যায়, প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলোর সুবাদে সে চেহারা-মুবারক দেখাও যায়, এটা কোন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নয়। যেন, কেবল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডই ধর্তব্যের এবং বিচার-বিবেচনার বিষয়। অন্যথা হলে, তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নয়। অবশ্য, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের মুরুদ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় হিসাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মুরুদও, দেশের মানুষ দেখেছে, নিকট অতীতের হত্যাকাণ্ড গুলোর (আহসান উল্লাহ মাষ্টার, আইভি রহমান, কিবরিয়া হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি) অভিজ্ঞতা থেকে। আমি এ সামগ্রিক বিষয়টাকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে চাই। কে এবং কীভাবে, কেন এবং কোন উদ্দেশ্যে সেটা যদিও একটি গুরুত্বপুর্ণ জিজ্ঞাসা বটে, এ হত্যাকাণ্ড ঘটালো তা আমার কাছে খুব বেশি গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে হয় না। ‘রাষ্ট্র তার নাগরিকের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ’, ‘মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যর্থ’ এবং ‘এ দেশে স্বাভাবিক মৃত্যুর কোন নিশ্চয়তা নেই’ এ থিসিস গুলো আমার কাছে অধিকতর বিবেচ্য বলে জ্ঞান হয়। অধ্যাপক তাহেরের এ মর্মান্তিক মৃত্যু এ থিসিস গুলোকে নিয়ে ভাববার এবং ভাবনা-উত্তর একটি সিদ্ধান্তে অনুমিত হবার বিষয়টি আমাদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়। সে অনুমিত সিদ্ধান্ত থেকেই আমাদেরকে আমাদের করণীয় কী, তা ঠিক করবারও তাগিদ দেয়।

খুন বা হত্যাকাণ্ড কেনো ঘটে?- এ জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক জবাব হতে পারে। মোটাদাগে বলা যায়, অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা, পারস্পরিক শত্রুতা, ব্যক্তি বিশেষের লোভ বা সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা, দখলদারিত্বের মনোভাব, বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রবণতা, ধর্মীয় উন্মত্ততা, অনিয়ন্ত্রিত রাগ-ক্ষোভ, সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাস। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে শত্রুতা থাকতেই পারে। লোভ মানুষের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাগও মানুষের স্বাভাবিক মনস্তত্ব। মানুষকে তার স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব থেকে, সহজাত প্রবৃত্তি থেকে এবং সামাজিক নির্মিতি থেকে বিযুক্ত করে চিন্তা করা যাবে না। কেননা, মানুষের অস্তিত্বের সাথেই তার স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের বসবাস। তাই, এই কনটেক্সেটে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিরোধের প্রাথমিক উপায় হচ্ছে একটি সামাজিক সুসম্পর্কের সহনশীল সংস্কৃতির চর্চা করা। বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবকাঠোমোয় বিদ্যমান স্কুলিং-প্রতিষ্ঠানগুলোতে সামাজিক সুসম্পর্কের সহনশীল সংস্কৃতির একটি পাঠ অনিবার্য করে তুলা যায় কিনা, তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার করা যেতে পারে। যার মধ্য দিয়ে মানুষের যে মনস্তাত্ত্বিক গড়ন এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মিতি তার অন্তরালে একটি হত্যা-বিরোধী চেতানার পাটাতন তৈরী করা সম্ভব। যদিও, সেখানেও নাগরিক নিরাপত্তার প্রশ্নে রাষ্ট্রের ভুমিকার জিজ্ঞাসাটি কম গুরুত্বপুর্ণ নয়। তথাপি, মানুষের অস্তিত্বের এ স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব বাদ দিলে বাদবাকি সন্ত্রাস, ধর্মীয় উন্মত্ততা এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রশ্ন আসলেই আসে রাষ্ট্রের প্রশ্ন। এখানেই রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বের বিষয়-আশয় আসে। রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, নাগরিক অধিকার এবং সাধারণ নাগরিকের স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তার প্রশ্ন আসে।

অধ্যাপক তাহেরের কেনো একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো, কেনো একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হলো, যে কোন বিচারেই এ জিজ্ঞাসার জবাব সরকারকেই দিতে হবে। কেননা, অধ্যাপক তাহের হত্যাকাণ্ড-সম্পর্কিত এ জিজ্ঞাসা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং নাগরিক অধিকার-প্রপঞ্চের সাথে সম্পৃক্ত। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই' জাতীয় দাবি-দাওয়ার কথা শোনা যায়। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে, একজন স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের নাগরিককে 'স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা' জন্য সরকারের কাছে দাবিনামা পেশ করতে হয়। 'স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা চাই' সাধারণ নাগরিকের এ দাবি যে কোন বিচারেই একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক পতন এবং তলাহীনতার স্বাক্ষর বহন করে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামগ্রিক অযোগ্যতার কারণেই রাষ্ট্র আজ একটি ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। সরকারী দল এবং বিরোধী দলের, যে দলই সরকারে বা বিরোধী দলে থাকুকনা কেনো, যৌথ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কারণে বাংলাদেশ আজ একটি নির্মম মৃত্যুর উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। ক্ষমতা-কেন্দ্রীক রাজনীতি, গদি-মুখী রাষ্ট্রনীতি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে করেছে জনবিচ্ছিন্ন, রাজনীতিকে করে তুলেছে অন্তঃসারশুন্য এবং রাষ্ট্রকে গড়ে তুলেছে গণবিমুখ। ফলে, আজ বাংলাদেশে মানুষের স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবার বিষয়টি একটি বাসনা-প্রার্থনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। একটি রাষ্টের জন্য, গদিসীন সরকারের জন্য তো বটেই, এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু নেই। সরকার প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্টতার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সকল কর্তাব্যক্তিকে এ হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের চর্চিত যে 'হত্যাকাণ্ড-সংস্কৃতি' (গরম গরম ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করা, প্রতিবাদ করা, মিছিল-মিটিং করা, সংবাদপত্রের আহাজারি, দাবিনামা পেশ করা, 'জোর দতন্ত চলছে' বলতে বলতে সময়ের সাথে সাথে মিলিয়ে যাওয়া প্রভৃতি) গড়ে উঠেছে, সেই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার পয়লা কদম হচ্ছে রাষ্ট্রীয় এবং নাগরিক নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এবং

প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদেরকে, প্রতিষ্ঠান গুলোকে তো বটেই, রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণে কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা। সাধারণ নাগরিকের সম্মিলিত এবং স্বতস্ফূর্ত উদ্যোগ প্রশাসনযন্ত্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিতার সংস্কৃতির আওতায় আনতে বাধ্য করতে পারে। আর, একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে উঠলেই, নাগরিক অধিকারপ্রশ্নে, স্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়টি তখন এমনিতেই অধিভুক্ত হবে, রাষ্ট্র একটি শক্তিশালি এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে। আমার বিবেচনায় অধ্যাপক তাহেরের মৃত্যু আমাদেরকে সেই তাগিদই দেয়। নিজেদেরকে নিজেদের করণীয় কী কী সেটা উপলব্ধির একটা মওকা দেয়। আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে স্বীয় করণীয় নির্ধারণ করা। এবং এই ব্যষ্টিক উপলব্ধির একটি সমষ্টিক রূপায়ন আমাদের সামগ্রিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে নিঃসন্দেহে। এই আত্ম-উপলব্ধির কার্যকর প্রয়োগের মধ্যেই বিদ্যমান আছে অধ্যাপক তাহেরের এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের সত্যিকার প্রতিবাদ।